বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এলাকার ওয়াশ মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও সরকারি পদক্ষেপ

উত্তরণ

তালা, সাতক্ষীরা

BANGLADESH WASH ALLIANCE
Supported by Duch WASH Alliance

Simavi

Uttaran

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এলাকার ওয়াশ মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও সরকারি পদক্ষেপ

প্রকাশ কাল
ডিসেম্বর, ২০১৯

সার্বিক নির্দেশনা
শহিদুল ইসলাম
পরিচালক, উত্তরণ

সম্পাদনায়
হামেশ আলী ফকির
পরামর্শক

হাসিনা পারভীন
প্রকল্প সমন্বয়কারী, উত্তরণ

বৃষ্টি ঝরা বিপ্লব
মনিটরিং ইভাল্যুয়েশন অফিসার, উত্তরণ

নাজমা আক্তার
প্রজেক্ট অফিসার (এডভোকেসী), উত্তরণ

হেদায়েতউল্লাহ মুকুল
প্রজেক্ট ম্যানেজার, উত্তরণ

রুসায়েদউল্লাহ
প্রজেক্ট অফিসার (টেকনিক্যাল এন্ড এডভোকসি), উত্তরণ

ডিজাইন
অংকুর, খুলনা

মুদ্রণ
প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস
স্যার ইকবাল রোড, মতি মসজিদের পিছনে, খুলনা
মোবাইল : ০১৭১১-২৭৫৪৮৪

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার প্রায় ৬০ লক্ষ অধিবাসী নিরাপদ পানির সংকট ও অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন সমস্যার কারণে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বলা বাহুল্য এ এলাকায় জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এ সমস্যাটি বড় ধরণের অন্তরায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সারা বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার যেখানে ২১.৫ শতাংশ সেখানে সাতক্ষীরা জেলায় দারিদ্র্যের হার ৪৬ শতাংশ। নিঃসন্দেহে এটি একটি উদ্বেগজনক অবস্থা। এলাকার নিরাপদ পানির সংকট ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মূল কারণ গুলো হলোঃ ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অভাব, আর্সেনিক ও আয়রণ সমস্যা, মাত্রাতিরিক্ত লবনাক্ততা, পোল্ডার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও মিষ্টি পানির উজান প্রবাহ হ্রাস, চিংড়ি চাষ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার, প্রবাহমান খাস জলাশয় ইজারা প্রদান, নদী-খাল দখল, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি।

এ এলাকায় অগভীর নলকূপে নিরাপদ পানি পাওয়া যায়না। খাবার পানির জন্য স্থান বিশেষ ২-৫/৬ কি:মি: দূরবর্তী এলাকা থেকে নারীদেরকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে গভীর নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। অধিকাংশ পরিবার এত দূর থেকে পানি সংগ্রহ করতে আসে না। এলাকায় চড়া মূল্যে যে পানি পাওয়া যায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে তা ক্রয় করা সম্ভব নয়। খাবার পানিতে লবনাক্ততার পাশাপাশি জলাবদ্ধতাও একটা বড় ধরনের সমস্যা। উপকূলীয় বাঁধ তথা পোল্ডার ব্যবস্থার কারণে প্রতি বৎসর এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। জলাবদ্ধতার একটু তীব্রতা দেখা দিলে প্লাবিত হয়ে এলাকার টিউবওয়েল এবং ল্যাট্রিন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল একটি অবহেলিত এলাকা। এ অঞ্চলের জন্য রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ যথেষ্ট অপ্রতুল। সরকার ঘোষিত জাতীয় নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালায় সুপেয় পানি সংকট বিষয়ে খাবার পানিতে লবনাক্ততার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ভাবে অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি এবং সমস্যাটি নিরসনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণে রয়েছে অপ্রতুলতা। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃসমন্বয়ের দুর্বলতা।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য(এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসডিজির ৬ নং লক্ষ্যমাত্রায় সবার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি প্রাপ্তি এবং স্যানিটেশন বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমরা আশা করব এ লক্ষ্য পূরণে বর্তমান ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার পানি ও স্যানিটেশন সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উত্তরণ তার জন্মকাল ১৯৮৫ সাল থেকে উপকূলীয় এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ পানি প্রাপ্তি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বর্তমানে দাতা সংস্থা 'সিমাভী নেদারল্যান্ড' এর আর্থিক সহায়তায় উত্তরণ "WASH SDG-WAI Bangladesh Subprogramme Implementation Phase" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আশা করি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন দ্বারা এলাকাবাসির সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমস্যা মোকাবেলার জন্য এলাকায় একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরী হবে।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক, উত্তরণ

সূচি পত্র :

ক্রম	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের অবস্থা		০৫
	১.১	পটভূমি	০৫
	১.২	সমস্যা ও তার কারণ সমূহ	০৫
২.	নিরাপদ পানি		০৫
	২.	নিরাপদ পানি কি?	০৫
	২.১	নিরাপদ পানির প্রয়োজনীয়তা	০৫
	২.২.	নিরাপদ পানির ব্যবহার	০৫
	২.৩	নিরাপদ পানির উৎস	০৫
	২.৪	দূষিত পানির ক্ষতিকর দিক সমূহ	০৬
	২.৫	নিরাপদ পানি সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ	০৭
	২.৬	নিরাপদ পানির উৎস/স্থাপনা পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী ও পুরুষের ভূমিকা	০৮
৩.	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা		১০
	৩.১	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা কি?	১০
	৩.২	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা	১০
	৩.৩	মলমূত্র থেকে যেভাবে রোগ ছড়ায়	১০
	৩.৪	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার পদ্ধতি	১০
	৩.৫	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রক্ষণাবেক্ষণ	১০
	৩.৬	স্বল্পমূল্যের বিভিন্ন প্রযুক্তির স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	১১
	৩.৭	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের স্থান নির্বাচন	১১
	৩.৮	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মানের সময় শিশু, বৃদ্ধ,গর্ভবতী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য করনীয়	১১
	৩.৯	সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ	১১
৪.	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা		১৩
	৪.১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধারণা	১৩
	৪.২	ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১৩
	৪.৩	পারিবারিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১৩
	৪.৪	পারিপার্শ্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	১৩
৫.	মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা		১৫
	৫.১	মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান সমস্যা	১৫
	৫.২	বয়ঃসন্ধিকাল কী?	১৫
	৫.৩	মাসিক বা ঋতুস্রাব কী ?	১৭
	৫.৪	স্যানিটারি ন্যাপকিন/কাপড় ব্যবহার,রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	১৮
	৫.৫	মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	১৮
	৫.৬	মাসিকের সময় খাদ্য খাবার	১৮
	৫.৭	মাসিক স্বাস্থ্য ব্যস্থাপনার অপর্যাপ্ততা এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি	১৮
	৫.৮	মাসিক নিয়ে ভুল ধারণা ও কুসংস্কার	১৯
	৫.৯	জটিলতা নিরসনে চিকিৎসকের পরামর্শ	২০
৬.	সরকারি পদক্ষেপ		২৩
	★ যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থল তৈরীতে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন		২৩
	★ পরিপত্র		২৬
৭.	সুপারিশ সমূহ		২৮

১.দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের অবস্থা

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চল তথা সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলা দুর্যোগ প্রবণ অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসাবে পরিচিত। বিশেষ করে জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে এলাকায় মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহ ও বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এই এলাকার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সংকট। প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ এই সমস্যা দ্বারা জর্জরিত।

১.২ সমস্যা ও তার কারণসমূহ

ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অভাব ঃ এই এলাকাটি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নিম্নাংশ হওয়ায় সুক্ষ্ম দানার পলি দ্বারা এখানকার ভূমি গঠিত হয়েছে। এখানকার ভূগর্ভস্থ জলাধার বা পানির স্তরের (একুইফার) অভাব রয়েছে। যে কারণে অনেক জায়গাতে সুপেয় পানির স্তর বা জলাধার পাওয়া যায় না।

মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা ঃ সমুদ্রের জোয়ার ভাটার এলাকা হওয়াতে লবণাক্ততার প্রভাব খুব বেশি। অন্য দিকে উজান অঞ্চলের মিষ্টি পানির প্রবাহ মারাত্মক ভাবে হ্রাস পাওয়ায় লবণাক্ততার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যাপকভাবে চিংড়ি চাষ। চিংড়ি চাষের কারণে ভূপৃষ্ঠের জলাধারগুলো ব্যাপকভাবে লবণাক্ত হয়ে পড়ছে এবং ভূগর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলোচ্ছ্বাস ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি ঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে এলাকায় একদিকে যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি জলোচ্ছ্বাসের প্রকটতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবছর এ সব ঘটনা দ্বারা উপকূলীয় বাঁধ ভেঙ্গে বা উপচিয়ে ব্যাপক এলাকা লবণাক্ত কবলিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া অভ্যন্তর ভাগের বহুদূর পর্যন্ত লবণাক্ততার প্রসার ঘটছে। জলোচ্ছ্বাস ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি জনিত প্লাবনে এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

জলাবদ্ধতা ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জলাবদ্ধতা প্রতি বছরের ঘটনা। প্রায় তিন যুগ ধরে এ সমস্যা অব্যাহত আছে এবং ক্রমশঃ এ সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর এলাকার অধিকাংশ নলকূপ ও ল্যাট্রিনগুলো জলাবদ্ধতা দ্বারা প্লাবিত হয়ে যায়। দেখা দেয় পানি বাহিত বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রকটতা।

আর্সেনিক দূষণ ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের অধিকাংশ নলকূপের পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় আয়রণ ও আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া যায়। সবুজ রং চিহ্নিত টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিকমুক্ত, নিরাপদ। লাল রং চিহ্নিত টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিক দ্বারা দূষিত। আর্সেনিক দূষণযুক্ত পানি খাওয়া ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তবে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। মনে রাখা প্রয়োজন, আর্সেনিক দূষণযুক্ত পানি ফুটালেও আর্সেনিকমুক্ত হয় না।

২. নিরাপদ পানি কি?

পরিস্কার স্বচ্ছ পানিই নিরাপদ পানি নয়। প্রকৃত পক্ষে যে পানিতে রোগ-জীবাণু ও আবর্জনা নেই এবং যে পানিতে সকল প্রকার রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থ নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় বিদ্যমান থাকে তাকে নিরাপদ পানি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং দৈনন্দিন সকল কাজে তা ব্যবহার যোগ্য।

২.১ নিরাপদ পানির প্রয়োজনীয়তা

পানির অপর নাম জীবন। কারণ পানি ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচতে পারেনা। আবার এই পানিই মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পানি পান ছাড়াও অন্যান্য সকল কাজে পানি আমাদের নিত্য সঙ্গী। মানুষের শরীরে ৬০ ভাগ পানি থাকে। এই পানি যদি দূষিত হয় তাহলে দৈহিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করা যেমন কঠিন হয়ে পড়ে তেমন বিভিন্ন রোগজীবাণু শরীরের মধ্যে বাসা বাঁধতে পারে। উল্লেখ্য যে, মানুষের সকল রোগ-ব্যাধির ৮০ ভাগই আসে পানি থেকে। সেকারণে খাবার পানি ছাড়াও অন্যান্য সকল কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.২. নিরাপদ পানির ব্যবহার

- নিরাপদ পানি পান করা।
- রান্না, থালা-বাসন ধোয়া, হাত-মুখ ধোয়া ও গোসল করার কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।
- রান্নার কার্যক্রম শুরু করার আগে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে দু'হাত ধোয়া এবং রান্নার সামগ্রী নিরাপদ পানি দিয়ে পরিস্কার করা।

- খাবার পরিবেশনের আগে, খাওয়ার আগে ও পরে নিজেসহ পরিবারের সকলের সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে দু'হাত ধোয়া।
- শিশুকে খাবার খাওয়ানোর আগে শিশুসহ নিজের দু'হাত সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে ধোয়া।
- শৌচকার্যের সময় ও পরবর্তীতে হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে সাবান ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।

২.৩ নিরাপদ পানির উৎস

প্রাকৃতিক ভাবে পানির উৎস দুই প্রকার। যথাঃ ক) ভূপৃষ্ঠের পানি ও খ) ভূগর্ভস্থ পানি। ভূপৃষ্ঠের সকল পানিই দূষিত পানি। কেননা বায়ু, বৃষ্টি ধোয়া পানি, পশুপাখি-কীটপতঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে এই পানি দূষিত হয়। ভূগর্ভস্থ পানিও আর্সেনিক, আয়রণ, লবণাক্ততা বা অন্যান্য কারণেও দূষিত হতে পারে।

লবণাক্ত এলাকায় নিরাপদ পানির উৎসসমূহ

ক) **গভীর নলকূপ ঃ** বাংলাদেশের গভীর নলকূপ সাধারণত ৩০০ থেকে ১২০০ ফুটের মধ্যে হয়ে থাকে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এবং উপকূল এলাকায় এ নলকূপের গভীরতা ৭০০ থেকে ১২০০ ফুটের মধ্যে। গভীর নলকূপের এ পানি নিরাপদ। অধিকাংশ এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপনের জলাধার পাওয়া যায়না। যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে দুরুহ হয়ে পড়ে। সাধারণত ২ থেকে ৫ কিঃ মিঃ দূর থেকেও এসে পানি সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হয়। পানি সংগ্রহের কাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা ভোগান্তির শিকার হয়। এতে প্রতিদিন ২ থেকে ৪ শ্রম ঘন্টার অপচয় ঘটে। আর এ সব কারনে দূরের অধিকাংশ পরিবার গভীর নলকূপের পানি সংগ্রহ করতে আসেনা।

খ) **বৃষ্টির পানি (রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্লান্ট) ঃ** পানীয় জল হিসেবে বৃষ্টির পানি নিরাপদ, লবনাক্ত এলাকায় সংগৃহীত বৃষ্টির পানিই নিরাপদ পানির বিকল্প উৎস হতে পারে।

কিভাবে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা যায়-

- টিনের চালের শেষ প্রান্তে একটি টুয়া বা টিনের একটি চ্যানেলের সাহায্যে মাটির মটকায়/পাঁকা ট্যাংকে সংগ্রহ করা;
- বৃষ্টি শুরুর প্রথম ৫-১০ মিনিট পর পানি সংগ্রহ করতে হবে;
- পানি সংরক্ষণের জন্য একটি ট্যাংক, প্লাস্টিক টুয়া, কলের ট্যাপ ইত্যাদির জন্য খরচ হয় মাত্র ১৫,০০০ টাকা;
- বার্ষিক মেরামত খরচ ১,০০০ টাকা।

সতর্কতা-

সঠিক পদ্ধতিতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা না হলে এবং দীর্ঘদিন পাত্রে রাখার ফলে পানিতে ব্যাকটেরিয়া বা এক ধরনের পোঁকা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে পানি শোধনের জন্য চারকোল বা বালুর ফিল্টার ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ) **পন্ডস্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) ঃ** গ্রাম্য এলাকায় পানির একটি প্রধান উৎস হলো পুকুর যা পিএসএফ হিসাবে নিরাপদ পানি সংগ্রহের জন্য একটি সহজ এবং সুলভ উপায় হতে পারে। এর জন্য পুকুরের পাড়ে একটি ট্যাংক ও সাথে একটি টিউবওয়েল প্রয়োজন হয়। ট্যাংকের ভেতর কয়েকটি চেম্বার (৩টি) থাকে, যেখানে বালি ও বিভিন্ন পাথরের স্তর থাকে। টিউবওয়েলে পাম্প করলে পুকুর থেকে পানি ট্যাঙ্কিতে এসে জমা হয়। তারপর বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে সেটি বিশুদ্ধ হয়ে নিচে জমা হয় যেখান থেকে ট্যাপ এর মাধ্যমে পানি সংগ্রহ করা হয়। একটি মাঝারি আকারের পুকুর থেকে ১৫০-২০০ পরিবারের পানির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, যেখানে এটি তৈরীতে খরচ হতে পারে ১,৫০,০০০ - ১,৭০,০০০ টাকা। উল্লেখ্য যে পুকুরের পানিতে কোন আর্সেনিক ও আয়রনের উপস্থিতি নাই।

ঘ) **ছোট পরিবারের ফিল্টার ঃ** এই ধরনের ফিল্টার তৈরী করা হয় ৩০০-৪৫০ মি.মি.পুরু বালি ও ১৫০-২২৫ মি.মি. পুরু জমাকৃত পাথর খন্ড একটি সিলিন্ডার আকৃতির বড় পাত্রে। বালি ও পাথরের স্তর সব সময় পানি দ্বারা ভেজা থাকতে হবে যেন কখনই সেটি শুকিয়ে না যায়। এটি নিকটস্থ বাজারে সহজলভ্য, তাই খুব সহজেই একটি ছোট পরিবারের জন্যে এটি বিশুদ্ধ পানির যোগান দিতে পারে।

ঙ) **আর্সেনিক ও আয়রণ দূরীকরণ প্রযুক্তি (এআইআরপি) ঃ** যে সব এলাকায় আর্সেনিক ও আয়রণ এর মাত্রা অধিক, সে সব এলাকার জন্যে এটি একটি উত্তম প্রযুক্তি। এখানেও পন্ডস্যান্ড ফিল্টারের মত টিউবওয়েল এর মাধ্যমে পাম্প করে পানি ট্যাঙ্কিতে এনে পরে বিশুদ্ধ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় আয়রণ ৯০-৯৮% ও আর্সেনিক ৭০-৭৫% পর্যন্ত দূর করা সম্ভব হয়। একটি এআইআরপি ১০ টি পরিবারের পানির চাহিদা মেটাতে পারে। টিউবওয়েল এর খরচ বাদে মেশিনটির জন্যে খরচ হতে পারে ২২,০০০- ২৫,০০০ টাকা।

চ) **পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ঃ** ফোটানো- যেখানে টিউবওয়েল নেই সেখানে পুকুর/নদী/ডোবা-নালার মিঠা পানি ফুটিয়ে নিরাপদ করা যায়। ফুটন্ত পানিতে রোগ জীবাণু থাকে না। জীবাণুমুক্ত করার জন্য পানিতে বলক উঠার পরে অন্তত ২০ মিনিট ফোটাতে হবে।

ফিটকিরি দিয়ে- পানিতে ফিটকিরি মিশিয়ে পানি শোধন করা যায়। ২৫ লিটার পানি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছেকে ২ চা চামচ ফিটকিরি মিশিয়ে বেশ কিছু সময় ভাল করে নেড়ে কমপক্ষে ১ ঘন্টা এই পানি রেখে দিতে হবে। খুব সাবধানে উপরের পানি তুলে ব্যবহার করতে হয়।

পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট দিয়ে- পানি বিশুদ্ধ করার জন্য নানা রকম ট্যাবলেট পাওয়া যায়। তবে এগুলো ব্যবহার করার আগে দেখে নিতে হবে ট্যাবলেটের স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়েছে কিনা এবং সহজে ও তাড়াতাড়ি এগুলো পানিতে মিশ্রিত হয় কিনা। ব্যবহার বিধি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করা যাবে না। হ্যালোজেন (ইউএসসি ১৫ মিলি গ্রাম) কি মাত্রায় পানি দূষিত,তা বিবেচনা করে ১.৫ থেকে ৩ লিটার পানি পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে ১ টি হ্যালোজেন বা হ্যালো ট্যাবলেট পানিতে দিয়ে আধা থেকে এক ঘন্টা রেখে দিলে পানিতে রোগ জীবাণু থাকে না।

২.৪ দূষিত পানির ক্ষতিকর দিক সমূহ

দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ হয় যেগুলোকে আমরা সাধারণভাবে পানি সৃষ্ট/পানি বাহিত রোগ বলি। নিরাপদ পানি ব্যবহার করলে (ব্যবহার বিধি অনুযায়ী) এই সমস্ত রোগ-ব্যধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য পানি বাহিত রোগগুলো হলোঃ

- হেপাটাইটিস, ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, চর্মরোগ, টায়ফয়েড, প্যারা টায়ফয়েড, গোলকৃমি, সূতাকৃমি, জন্ডিস ইত্যাদি
- পোলিও, ধনুষ্টংকার এটি একটি মারাত্মক রোগ যা দূষিত পানি ব্যবহার করলে হয়
- আর্সেনিকোসিস-দীর্ঘদিন আর্সেনিক দূষিত পানি ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া
- হাত ও পায়ের তালু খসখসে/ফেটে যাওয়া
- সারা শরীরে গোটা গোটা অনুভূত হওয়া
- বুক ও পিঠে সাদা কালো দাগ পড়া
- চোখ লাল হয়ে যাওয়া
- চামড়ার ক্যান্সার
- লিভারের সমস্যা
- হাত ও পায়ের পঁচন দেখা দেওয়া
- সময়মত চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুও হতে পারে।

২.৫ নিরাপদ পানি সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ

- পাত্রে পানি নেওয়ার আগে হাত ভাল করে ধুয়ে নেওয়া
- পানি ভরার আগে পাত্রের ভিতর ও বাহির ভালোভাবে মেজে নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়া
- কলসির বাড়তি পানি হাত দিয়ে ফেলা যাবে না, প্রয়োজনে কলসি কাত করে ফেলতে হবে
- পানি নেওয়ার সময় পরিষ্কার ঢাকনা দিয়ে কলসিটি ঢেকে নেওয়া
- বাড়িতে খাবার পানি ঢেকে রাখা
- পানির কলসি/পাত্র নিচু এবং ভেজা বা স্যাঁতস্যাতে জায়গায় না রেখে উঁচু এবং শুকনা জায়গায় পরিষ্কার ঢাকনা দ্বারা ঢেকে রাখা
- পরিষ্কার পাত্রে পানি পান করা
- পরিস্কার পাত্রে যাতে কেউ হাত ডোবাতে না পারে এবং তা থেকে যাতে কেউ সরাসরি চুমুক দিয়ে পানি খেতে না পারে তা নিশ্চিত করা
- পাত্র থেকে পানি উঠানোর জন্য পরিষ্কার হাতা অথবা মগ ব্যবহার করা
- পানির উৎস নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ রাখা
- যে পুকুরের পানি (পন্ড স্যান্ড ফিল্টার) পান করা হয় সে পুকুরে মানুষ ও গবাদিপশুর গোসল, মাছ চাষ, পুকুরপাড়ে চাষাবাদ করা থেকে বিরত থাকা
- পানির উৎস থেকে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে মলমূত্র এবং নোংরা পানি (বিশেষ করে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের পানি) নিষ্কাশন করা
- পানির উৎস থেকে অন্তত ১০ মিটার দূরে স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরি করা
- সংরক্ষণ করা পানি থেকে পশু-পাখিকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ

- টিনের চাল নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে
- চালে যাতে পাতা বা অন্য কিছু না পড়ে সেই ব্যবস্থা করতে হবে
- ৬ মাস পর পর ব্লিচিং পাউডার দিয়ে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্লান্ট পরিষ্কার করতে হবে
- রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্লান্ট এর পানির কল নষ্ট বা ফাটা থাকলে এবং প্লাটফর্ম ভাঙ্গা থাকলে দ্রুত মেরামত করতে হবে। তা নাহলে পানি দূষিত ও অপচয় হবে এবং পরিবেশ নোংরা হবে।

পিএসএফ রক্ষণাবেক্ষণ

- পুকুরের পাড় নিচু হলে পাড় উপচে অথবা পাড় যথেষ্ট শক্ত না হলে পাড় ভেঙ্গে বন্যা বা বর্ষার ময়লা পানি পুকুরে ঢুকে পানি দূষিত করে। তাই পুকুরের পাড় উঁচু ও শক্ত করে বাঁধতে হবে।
- পুকুরে হাঁস চরালে, গরু/ছাগল গোসল করালে, এমনকি নিজেরা গোসল করলে পানি দূষিত হয়। তাই এসব কাজ থেকে বিরত থাকব।
- পুকুরে হাড়ি-পাতিল এবং কাপড়-চোপড় ধুলে, বিশেষ করে রাসায়নিক খাবার ব্যবহার করে মাছ চাষ করলে পুকুরের পানি মারাত্মক দূষিত হয়। তাই পিএসএফ এর জন্য ব্যবহৃত পুকুরে হাড়ি-পাতিল ও কাপড়-চোপড় ধোয়া যাবে না এবং মাছ চাষ করা যাবে না।
- পিএসএফ এর পানির কল নষ্ট বা ফাটা থাকলে এবং প্লাটফর্ম ভাঙ্গা থাকলে দ্রুত মেরামত করতে হবে। তা নাহলে পানি দূষিত ও অপচয় হবে এবং পরিবেশ নোংরা হবে।
- পিএসএফ এর ড্রেনে ময়লা-আবর্জনা ও জমে থাকা পানি পরিষ্কার করতে হবে। তা নাহলে পরিবেশ দূষিত হয়।
- পিএসএফ এর উপরের ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত পাইপের পানি নিচে নেমে গেলে বুঝতে হবে ট্যাংক এর পানি শেষ হয়ে গেছে এবং পানি পরিশোধন বন্ধ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে টিউবওয়েল চেপে পানি ট্যাংকে তুলতে হবে।
- ৩ মাস পর পর পিএসএফ এ ব্যবহৃত বালু/খোয়া/কাঁকর বের করে ঘষে এবং ট্যাংক ব্লিচিং পাউডার দিয়ে মেজে পরিষ্কার করতে হবে।

২.৬ নিরাপদ পানির উৎস/স্থাপনা পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী ও পুরুষের ভূমিকা

উন্নয়নের অন্যান্য ইস্যু/ বিষয়ে নারীর ভূমিকা গৌণ হলেও নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে নারীই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে নারীর ভূমিকা মূখ্য হলেও পায়খানা, পানির প্লান্ট/নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে পুরুষদের সিদ্ধান্তই প্রাধান্য পায়। এক্ষেত্রে নারীর সুবিধা অসুবিধার দিকটি খুব বেশি গুরুত্ব পায় না। অন্যদিকে, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মত বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র নারীর উপর নির্ভরশীল। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মত বিষয়গুলো শুধুমাত্র নারীর উপর নির্ভর করে নিশ্চিত করা কঠিন। এ কাজে পুরুষদেরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

নারীর ভূমিকা

- পানির প্লান্ট/স্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়া;
- পানি প্রযুক্তি স্থাপনা নির্মাণে নারীর ব্যবহারিক সুবিধা অসুবিধা তুলে ধরা;
- নিরাপদ পানি ব্যবহারে পরিবারের পুরুষদের উৎসাহিত করা;
- স্থাপনাসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অংশগ্রহণের জন্য পুরুষদের উৎসাহিত করা।

পুরুষদের ভূমিকা

- নিরাপদ পানির স্থাপনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের অংশ নেয়া;
- নিরাপদ পানি সংগ্রহ, বহন ও সংরক্ষণে সহায়তা করা;
- নারীর অসুস্থতা কিংবা গর্ভকালীন সময়ে পানি সংগ্রহ, বহন, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করা;
- পানি প্রযুক্তি স্থাপনে নারীর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

নিরাপদ পানির উৎসগুলোর দলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

পিএসএফ এবং রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহারকারী নারী পুরুষদের মধ্য থেকে অন্তত ২/৩ জনকে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের দায়িত্ব হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পিএসএফ এবং রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের মধ্য থেকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান এবং প্রয়োজনে কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

"পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আমাদের অবস্থান কোথায়?"

পানি

আর নয় অবহেলা, নিজেদের সুরক্ষায় সোচ্চার হই সবাই

সেফলি ম্যানেজড

১. পানির উন্নত উৎস।
২. বাড়ির সিমানার ভিতর অবস্থিত।
৩. সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমানে প্রাপ্যতা।
৪. সর্বপ্রকার দূষণমুক্ত।

বেসিক

১.পানির উন্নত উৎস।
২. ৩০ মিনিটের কম সময়ে প্রাপ্যতা।

লিমিটেড

১.পানির উন্নত উৎস।
২. ৩০ মিনিটের অধিক সময়ে প্রাপ্যতা।

আন-ইমপ্রুভড

১. অনুন্নত পানির উৎস।

নো সার্ভিস

১. নদী, খাল বা পুকুরের পানি সরাসরি পান।

BANGLADESH WASH ALLIANCE
Supported by Duch WASH Alliance

Simavi

Uttaran

৩. স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা

৩.১স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা কি?

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বলতে বোঝায় যে পায়খানায় মল মূত্র ঢাকা থাকে যাতে রোগ জীবাণু ও দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে না এবং পায়খানা ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ বেষ্টনি দ্বারা ঘেরা থাকে।

৩.২ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

- সুস্থভাবে জীবন যাপন করা যায় ও রোগ জীবানুর বিস্তার রোধ হয়
- ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমি, জন্ডিস ও অন্যান্য রোগ ছড়ায় না
- পানি ও বাতাস নিরাপদ থাকে ও পরিবেশ সুন্দর থাকে
- পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমে
- গোপনীয়তা বজায় থাকে
- ডাক্তার ও ঔষধের ক্ষেত্রে খরচ কমে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়
- সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৩.৩ মলমূত্র থেকে যেভাবে রোগ ছড়ায়

আমাদের খাদ্যনালীতে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু মলের মাধ্যমে দেহের বাহিরে আসে। সব মলে, এমনকি শিশুদের মলেও জীবাণু থাকে। খোলা জায়গায় বা খোলা ল্যাট্রিনে পায়খানা করলে বায়ু, মশা-মাছি, পোকা-মাকড় প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয় এবং পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। মানুষের মলে যে জীবাণু থাকে তা দ্বারা ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমিসহ বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হয়।

৩.৪ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার পদ্ধতি

- পায়খানা ঘর নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- পায়খানা ব্যবহারের সময় স্যান্ডেল ব্যবহার করতে হবে
- শৌচকার্যে সাবান ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে
- শিশু সহ পরিবারের সকলে পায়খানা থেকে ফিরে দুই হাত একসঙ্গে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে ভালোভাবে ঘষে ধুয়ে নিতে হবে
- মল ত্যাগের পূর্বে প্যানটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে
- পায়খানা ঘরের ভিতরে বা বাইরে পাত্র ভর্তি পানি এবং সাবান রাখতে হবে
- পায়খানা ব্যবহারের পরে পর্যাপ্ত পানি ঢেলে প্যান পরিষ্কার করতে হবে
- ডান হাতে পানির কল খোলা ও বন্ধ করা ও ডান হাতে বদনা ধরা।

৩.৫ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রক্ষণাবেক্ষণ

পায়খানা ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও টেকসই করার জন্য নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া পায়খানা ঘরটি স্বাস্থ্যসম্মত রাখা সম্ভব নয়।এজন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে ঃ

- পায়খানার প্যান ও স্ল্যাব নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে।
- সপ্তাহে অন্তত একদিন জীবাণুনাশক হিসেবে ব্লিচিং বা হারপিক ব্যবহার করতে হবে।
- বেশি পরিমাণে পানি ঢেলে সাইফুন পরিষ্কার রাখতে হবে। সাইফুন থেকে মল না সরলে বুঝতে হবে সাইফুনে কোন কিছু আটকে গেছে। এক্ষেত্রে প্রথমে পর্যাপ্ত পানি ঢেলে পরিষ্কার করা যেতে পারে। তাতেও পরিষ্কার না হলে বুঝতে হবে শক্ত কিছু আটকে গেছে। তখন বাঁশের কাঁচা কঞ্চি দিয়ে পরিষ্কারের চেষ্টা করতে হবে। এতেও পরিষ্কার না হলে সুইপার ডেকে পরিষ্কার করা যেতে পারে।
- পায়খানার গর্ত ভর্তি হয়ে গেলে পাশে আর একটি গর্ত করে আগের গর্তের সাথে সংযোগ করে দিলে পায়খানাটি পুনরায় ব্যবহার উপযোগী হবে।
- পায়খানার ভিটি বা গর্তের পাড় কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে পুনরায় মাটি দিয়ে মেরামত করতে হবে।পায়খানা আশপাশসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩.৬ স্বল্পমূল্যের বিভিন্ন প্রযুক্তির স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

স্বল্প মূল্যের বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করা সম্ভব। স্থানীয় বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে এ ধরণের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করা যায়। একটি পায়খানার তিনটি অংশ থাকে যথা: উপরি কাঠামো বা ছাউনি, পাটাতন বা স্ল্যাব এবং পিট বা গর্ত।

উপরি কাঠামো ঃ স্বল্প মূল্যের বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার মধ্যে ছনের তৈরী উপরিকাঠামো, তালপাতার তৈরী উপরিকাঠামো, খেজুর পাতার তৈরী উপরিকাঠামো পায়খানাসমূহ বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য এবং জনগোষ্ঠির কাছে গ্রহণযোগ্য, বিশেষ করে দক্ষিনাঞ্চলের জন্য এধরণের ল্যাট্রিন খুব উপযোগী।

পাটাতন বা স্ল্যাবঃপাটাতন বা স্লাবের জন্য স্থানীয়ভাবে তৈরী কংক্রিটেরস্লাব,কলসি বা মটকার স্লাব,কাঠের পাটাতন ব্যবহার করা যেতে পারে যার মূল্য খুবই কম এবং স্থানীয়ভাবে সহজে সংগ্রহ করা যায়।

পিট বা গর্তঃপায়খানার নিচের অংশ তথা পিট বা গর্তের জন্য মটকা বা কলসি,কংক্রিটের পাঁচটি রিং ব্যবহার করা অথবা কংক্রিটের একটি রিং ব্যবহার করা।

৩.৭ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের স্থান নির্বাচন

- উঁচু জায়গা হতে হবে,
- যাতায়াতের সুবিধা হতে হবে,
- নলকুপ বা পানির উৎস হতে ৩০ ফিট দূরে হতে হবে,
- স্যাঁতস্যাতে জায়গায় করা যাবে না,
- বাড়ির কাছে হতে হবে,
- সবাই যেন ব্যবহার করতে পারে।

৩.৮ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মানের সময় শিশু,বৃদ্ধ,গর্ভবতী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য করনীয়

১. হাতল ও মাঝখানে গোল ফোঁকরওয়ালা শক্ত কাঠের চেয়ার গর্তের মুখ বরাবর স্থাপন করা। খেয়াল রাখতে হবে যাতে চেয়ারের ফোঁকর আর পায়খানার মুখ সরাসরি হয়।

২. ব্যবহারকারীরা যাতে পায়খানা ব্যবহারের জন্য শক্ত কিছু ধরে উঠতে ও বসতে পারে সে জন্য পায়খানার ডান বা বাম দিকে, ব্যবহারকারীর সুবিধা অনুযায়ী উচ্চতায় লম্বা হ্যান্ডেল/হাতল বসানো যেতে পারে।

৩. পায়খানার ভিতর সুবিধাজনক স্থানে সব সময় এক বালতি/ মটকা পানি ও সাবান/ছাই রাখতে হবে।

৩.৯ সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ

- উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা
- ইউনিয়ন পরিষদ
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

আপনার এবং আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্যের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত দপ্তর ও ব্যক্তির নিকট থেকে সহযোগিতা আদায় করা আপনার দায়িত্ব।

“পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আমাদের অবস্থান কোথায়?”

স্যানিটেশন

আর নয় অবহেলা, নিজেদের সুরক্ষায় সোচ্চার হই সবাই

সেফলি ম্যানেজড

১. উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা।
২. প্রতি খানার জন্য পৃথক পায়খানা।
৩. নিরাপদভাবে সেপটিক ট্যাংক পরিস্কার ও মল ব্যবস্থাপনা করা হয়।

বেসিক

১. উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা।
২. প্রতি খানার জন্য পৃথক পায়খানা

লিমিটেড

১. উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা।
২. নিজস্ব নয়, অন্য খানার সাথে শেয়ার করে।

আন-ইমপ্রুভড

১.অনুন্নত পায়খানা ব্যবহার করেন।

নো সার্ভিস

১. খোলা স্থানে মল ত্যাগ করেন।

BANGLADESH WASH ALLIANCE
Supported by Duch WASH Alliance
Simavi
Uttaran

৪.পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

৪.১ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধারণা

নিজে পরিষ্কার থাকা, পারিবারিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা এবং পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বলে। উল্লেখ্য যে অধিকাংশ রোগব্যাধির উৎস হলো অপরিচ্ছন্নতা। পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন দিয়ে আমরা সুস্থ ও সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারি।

৪.২ ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

- নিয়মিত গোসল করতে হবে
- নিয়মিত চুল সাবান/শ্যাম্পু দিয়ে ধুতে হবে
- পরিস্কার কাপড়-চোপড় পরতে হবেএবং বিছানা পত্র পরিষ্কার রাখতে হবে
- নিয়মিত চুল আঁচড়াতে হবে
- নিয়মিত নখ কাটতে হবে
- নিয়মিত পায়খানা ঘরে স্যান্ডেল পায়ে যেতে হবে
- পায়খানা থেকে এসে সাবান (সাবান না থাকলে ছাই) দিয়ে হাত ধুতে হবে
- খাবার খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে
- ঘুম থেকে উঠে ও রাতে ঘুমাতে যাবার আগে দাঁত মাজতে হবে

৪.৩ পারিবারিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

- বাড়ির মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে
- বাড়ির ময়লা আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট গর্তে ফেলতে হবে
- ময়লা আবর্জনা গর্তে ফেলার পর সামান্য কিছু ছাই দিয়ে ঢেকে দিতে হবে
- গর্ত ভরাট হয়ে গেলে মাটি দিয়ে গর্ত বন্ধ করতে হবে
- হাঁস-মুরগী পা দিয়ে ময়লা আর্বজনা যাতে না তোলে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে
- বাড়ির পায়খানা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে
- শিশুর মল পায়খানায় ফেলতে হবে
- গোয়াল ঘর, হাঁস-মুরগীর ঘর, রান্না ঘর,থাকার ঘরসহ বাড়ির সব কিছু পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- পরিবারের সকলে পরিচ্ছন্ন খাবার গ্রহণ করতে হবে।

৪.৪ পারিপার্শ্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাঃ

- বাড়ির আশ-পাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- ময়লা নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে সেখানে ফেলতে হবে
- যেখানে সেখানে পায়খানা প্রস্রাব করা যাবে না
- সকলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে
- এলাকার পুকুরের কচুরিপানা ও ঝোঁপঝাড় পরিস্কার করতে হবে
- রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

“পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আমাদের অবস্থান কোথায়?”

আর নয় অবহেলা, নিজেদের সুরক্ষায় সোচ্চার হই সবাই

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

বেসিক

১. নিজ বাড়িতে হাত ধোয়ার সুবিধা সম্বলিত ব্যবস্থা।

২. সাবান ও পানির উভয়ের উপস্থিতি থাকা।

লিমিটেড

১. নিজ বাড়িতে হাত ধোয়ার সুবিধা সম্বলিত ব্যবস্থা।

২. সাবান অথবা পানি যে কোন একটির উপস্থিতি থাকা।

নো সার্ভিস

১. নিজ বাড়িতে হাত ধোয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকা।

BANGLADESH WASH ALLIANCE
Supported by Duch WASH Alliance

Simavi

Uttaran

৫. মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১ মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান সমস্যা

ইউনেসকোর মতে, মাসিক স্বাস্থ্যের জন্য বয়ঃসন্ধি সংক্রান্ত শিক্ষা, মাসিক সংক্রান্ত উপকরণ,সাবান,পানি,নিরাপদ টয়লেট ও বর্জ্য ফেলার উপযুক্ত জায়গা প্রয়োজন। কিন্তু সীমিত সম্পদ, বিদ্যমান অবকাঠামো এবং যথাযথ উদ্যোগের অভাবে অনেক স্কুলেই এসব সুবিধা থাকে না। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হাইজিন বেজলাইন ২০১৪ অনুযায়ী, মাত্র ৪৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন রাখার আলাদা জায়গা রয়েছে। স্কুলগুলোতে পানি, স্যানিটেশন ও এর স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনার অভাব প্রকট। ৮৬ শতাংশ শিক্ষার্থী মাসিকের সময় পুরোনো কাপড় ব্যবহার করে। প্রায় এক চতুর্থাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী মাসিক কালে স্কুলে যায় না এবং প্রায় এক তৃতীয়াংশ মনে করে মাসিকের সমস্যা স্কুলের কর্মকান্ডে তাদের স্বাভাবিক অংশগ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। গ্রামাঞ্চলে মাত্র ৯ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী স্যানিটারি প্যাড এবং ৮৭ শতাংশ শিক্ষার্থী মাসিকের সময় পুরোনো কাপড় ব্যবহার করে। ৯০ শতাংশ গ্রামীণ শিক্ষার্থী বারবার ব্যবহারের জন্য তাদের মাসিকের কাপড় গোপন স্থানে সংরক্ষণ করে। শহর এলাকায় ২১ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী স্যানিটারী প্যাড এবং ৭৬ শতাংশ শিক্ষার্থী পুরোনো কাপড় ব্যবহার করে। অবশ্য কাপড় ব্যবহার ও নিরাপদ হয়,যদি তার রক্ষণাবেক্ষণ সঠিক নিয়মে হয়।

৫.২ বয়ঃসন্ধিকাল কী?

বয়ঃসন্ধি হলো শৈশব ও সাবালকত্বের মধ্যবর্তী শারীরিক-মানসিক পরিবর্তনের একটি ক্রান্তিকাল। একটি শিশুর শরীর একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে রূপান্তরিত হওয়া ও প্রজনন-সক্ষমতা লাভের প্রক্রিয়ার সময়কালই বয়ঃসন্ধিকাল। জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মানুষের জীবনের ১০-১৯ বছরের মধ্যবর্তী বয়সটাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে।

বয়ঃসন্ধিকালে প্রধানত দুই রকমের পরিবর্তন হয়, একটি শারীরিক ও অন্যটি মানসিক। এই দুই ধরনের পরিবর্তনই প্রাকৃতিকভাবে হয়। এ পরিবর্তন গুলো পরস্পর-নির্ভরশীল। অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে বাইরের পরিবর্তন গুলো ঘটে ভিতরের পরিবর্তনের ফলে, আর কিছু ক্ষেত্রে ভিতরের পরিবর্তন গুলো ঘটে বাইরের পরিবর্তনের ফলে। এই পরিবর্তন গুলো খুবই স্বাভাবিক, যা প্রতিটি মানুষের জন্যই সাধারন ঘটনা। কাজেই এগুলো নিয়ে লজ্জাবোধ করার কিছু নেই।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের পরিবর্তন ঃ

শারীরিক পরিবর্তন ঃ শারীরিক পরিবর্তন বলতে দৈহিক বা শরীরের পরিবর্তনকে বোঝায়। এই পরিবর্তনের কিছু অংশ শরীরের বাইরে আর কিছু অংশ শরীরের ভিতর হয়। বাইরের পরিবর্তনগুলো চোখে দেখা গেলেও ভিতরের গুলো দেখা যায় না। ছেলে ও মেয়ের শারীরিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে মিল এবং কিছু ক্ষেত্রে অমিল রয়েছে।

মানসিক পরিবর্তন ঃ

শরীরের পরিবর্তনের পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মনেও কিছু পরিবর্তন আসে। ফলে তাদের দৈনন্দিন আচরণে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনগুলো বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাভাবিক আচরণ বা ধর্ম। মানসিক পরিবর্তনের দিক থেকে ছেলে বা মেয়েতে কিছু অমিল থাকলেও মিলটাই বেশী থাকে। নিচে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পরিবর্তনগুলো দেখানো হলোঃ

- শারীরিক পরিবর্তনের ফলে কিশোর-কিশোরীদের মনে নানা কৌতূহল,প্রশ্ন ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং মানসিক চাঞ্চল্য তৈরী হয়
- নিজেদের শরীর, চেহারা,পোশাক-আশাক,আচার-আচরন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হয়
- প্রাকৃতিকভাবে দেহে তৈরী হওয়া হরমোনের প্রভাবে যৌনতা বিষয়ক আকাশ কুসুম চিন্তা করবার প্রবণতা দেখা দেয়
- বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি সহজাত কৌতূহল তৈরী হয়। অর্থাৎ কিশোররা কিশোরীদের ও কিশোরীরা কিশোরদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে
- মন-মেজাজ ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কখনো অল্পতেই খুশি হয় কখনো বা তুচ্ছ কারনেই দুঃখ পায়
- কেউ কেউ লাজুক ও আত্নকেন্দ্রিক হয়, কারও বা অনেক বন্ধুবান্ধব থাকে
- কোন কোন ক্ষেত্রে আত্ননির্ভরশীল হবার চেষ্টা করে
- নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রায় সব বিষয়ে স্বাধীনতা দাবি করে
- সবকিছুর প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীল বা আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে
- প্রায়ই একাকিত্বে বা বিষন্নতায় ভোগে।

ছেলে ও মেয়ের শারীরিক পরিবর্তনগুলো পাশাপাশি দেখানো হলো ঃ

মেয়েদের/কিশোরীদের	ছেলেদের/কিশোরদের
দ্রুত ওজন বাড়ে	দ্রুত ওজন বাড়ে
দ্রুত উচ্চতা বাড়ে	দ্রুত উচ্চতা বাড়ে
গন্ধযুক্ত ঘাম হয়	স্তনের বোঁটা কিছুটা বৃদ্ধি পায়
স্তনের আকৃতি পরিবর্তন হয়	বগল ও প্রজনন অঙ্গে লোম গজায়
বগল ও প্রজনন অঙ্গে লোম গজায়	হাত, পা ও বুকে লোম ওঠে, গোঁফ গজায়
হাত ও পায়ের লোম গাঢ় হয়	গলার স্বর ভেঙে যায় ও ভারী হয়
গলার স্বর একটু ভারী হয়	মুখে ব্রন হয়/হতে পারে
মুখে ব্রন হয়/হতে পারে	স্বপ্ন উত্তেজনা ও বীর্যপাত হয়
ঋতুস্রাব হয়	শরীরের গঠন মজবুত হয়, বুক কাঁধ চওড়া হয়
স্বপ্ন উত্তেজনা হয়/হতে পারে	শরীরের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে
কোমরের হাড় চওড়া হয়, উরু/রান ভারী হয়	
শরীরের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে	

বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা/ঝুঁকি ঃ

- মা-বাবা ও শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের জবাব না পেলে ও কৌতূহল নিবৃত্ত না হলে অথবা প্রশ্ন বা কৌতূহল নিবৃত্ত করতে দ্বিধা বোধ করলে, কিশোর-কিশোরীরা ভুল ও ক্ষতিকর তথ্যের সামনে পড়তে পারে। কারণ বন্ধুবান্ধব ও নিম্নমানের বই থেকে পাওয়া তথ্য সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত না ও হতে পারে। এসব ভুল তথ্য কিশোর-কিশোরীদের নানা ক্ষতির সম্মুখীন করে দিতে পারে।
- পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে তারা হতাশাগ্রস্ত বা বিভ্রান্তিকর আচরণ করতে পারে এবং বিপথগামী হয়ে যেতে পারে।
- অনেক ছেলেদের মধ্যে মাদক প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।
- এ বয়সে কিশোর-কিশোরীরা আবেগপ্রবণ থাকে, ফলে অন্যেরা তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায়। কখনো কখনো তারা ধর্ষণসহ নানা ধরনের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। অনেক সময় কিশোরদেরও এ বয়সে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়।
- কিশোরীদের রয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়, ফলে তাদের প্রতি অন্যেরা আকর্ষন বোধ করে এবং তাদের উত্ত্যক্ত করে। এ কারনে কিশোরীদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায় এবং চলাফেরা, আচরণ, স্কুলে যাওয়া ইত্যাদির উপর পাকাপোক্তভাবে নিয়ন্ত্রন করা হয়।
- কিশোরীদের ভুলিয়ে, প্রেমের ফাঁদে ফেলে পাচার করা হয়। কখনো বা তাদের বিক্রি করে দেয়া হয়।
- দরিদ্র পরিবারের অনেক কিশোর-কিশোরীকে এ বয়সেই অন্যের বাড়িতে বা বাইরে উপার্জনে যেতে হয়। সেখানেও যৌন নির্যাতনের শিকার হবার ভয় থাকে অথবা তাদের ভুলিয়ে কেউ কেউ তাদের থেকে নানা যৌন সুবিধা নেবার চেষ্টা করতে পারে।
- না জেনে না বুঝে কৌতূহলবশত বা অসৎ সঙ্গে পড়ে অনেক কিশোর বয়ঃসন্ধিকালেই ধূমপান ও অন্যান্য মাদক গ্রহণ করতে শেখে বা সমবয়সী কিশোরীদের উত্ত্যক্ত করে।

পরিবার ,সমাজ ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা ঃ

- শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলোকে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পরিবর্তন বলে গ্রহণ করা এবং বয়ঃসন্ধিকালীন যে কোন কৌতূহল নিবৃত্ত করতে বাবা-মা, ভাই-বোন ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য নেয়া;
- সঠিক তথ্য না জানার কারণে নিজে নিজে বা বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে কোন বিড়ম্বনাকর পরিস্থিতিতে পড়লে কিংবা কারো দ্বারা উত্ত্যক্ত বোধ করলে যথাসম্ভব দ্রুত অভিভাবকদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য কারও কাছে বিষয়টা খুলে বলা;

- প্রজনন অঙ্গ সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন শারীরিক সমস্যা বোধ করলে শুরুতেই অভিভাবকদের মাধ্যমে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করা;
- মন্দ লোকদের দেয়া যে কোন রকম প্রলোভনকে সযত্নে এড়িয়ে চলা;
- স্কুল ও অন্যত্র যাওয়া-আসার সময় পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সতর্ক থাকা। সম্ভব হলে সহপাঠীদের সাথে দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করা;
- ভালোভাবে না জেনে না বুঝে কোন দুঃসাহসিক অভিযানে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী না হওয়া।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভূমিকা ঃ

- কিশোর-কিশোরীদের সময় দেয়া এবং নানা প্রসঙ্গে আলাপচারিতায় বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো;
- কিশোর-কিশোরীদের সাথে সম্পর্কটাকে শাসনের সম্পর্কের উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া, যাতে তারা বন্ধুর মত সব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে;
- কিশোর-কিশোরীরা কোন সমস্যায় পড়লে বা ভুল করলে তাদের না ধমকিয়ে, শাস্তি না দিয়ে সমস্যা বা ঘটনাটা ভালোকরে বুঝবার চেষ্টা করা ও তার সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া;
- কিশোর-কিশোরীদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেয়া ও স্বাধীন সময়টা ওরা কিভাবে অতিবাহিত করে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর রাখা;
- কিশোর- কিশোরীদের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখার জন্য ইতিবাচক আলোচনা করা।

৫.৩ মাসিক বা ঋতুস্রাব কী ?

মাসিক মেয়েদের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মাসিক বয়ঃসন্ধিকালে শুরু হয়। প্রতিমাসে মেয়েদের জরায়ুতে গর্ভধারণের উপযোগী একটি আস্তর তৈরি হয়। গর্ভধারণ না করলে এই আস্তরটি যৌনিপথে রক্ত আকারে বের হয়ে আসে। এই প্রক্রিয়াকেই মাসিক বা ঋতুস্রাব বলে। প্রচলিত ভাষায় একে বলা হয় শরীর খারাপ, পিরিয়ড, মিনস ইত্যাদি। প্রতি মাসে সাধরণত ৩-৭ দিন পর্যন্ত মাসিকের রক্ত নিঃসরণ হতে পারে কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে ১০ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে তবে এটি নিয়মিত হলে স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হবে। রক্তপাতের এ সময়টাকে ‘মাসিকের সময়কাল’ বলে।

মাসিক একটি স্বাভাবিক বিষয়

মাসিক মেয়েদের একটি স্বাভাবিক বিষয় এবং এ নিয়ে ভয়, ঘৃনা, লজ্জা কিংবা মন খারাপের কিছু নেই। মাসিক চলাকালীন সময়ে তলপেট, কোমর, পিঠে অথবা মাসিকের রাস্তায় ব্যাথা হতে পারে। মাসিকের আগে অথবা মাসিক চলার সময় স্তনে সামান্য ব্যাথা,দুর্বল লাগা, বমি বমি ভাব, ক্লান্তবোধ করা এবং কাজে অনিহা ভাব আসতে পারে। এছাড়া আরও কিছু সমস্যা হতে পারে যেমন-মাসিক বন্ধ, অতিরিক্ত স্রাব, অল্পস্রাব, ব্যাথাযুক্ত মাসিক স্রাব, অনিয়মিত স্রাব ইত্যাদি। এসময় সমস্যায় পড়লে বড়দের সাথে ও প্রিয়জনের সাথে আলোচনা করা, ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং পরিবারের সদস্যদেরকেও কিশোরীদের প্রতি সহনশীল হতে হবে।

মাসিক চক্র ঃ

- মাসিক মেয়েদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এটি মেয়েদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা ও সন্তান ধারণ সক্ষমতার লক্ষণ।
- বাংলাদেশের মেয়েদের সাধারণত ৯ থেকে ১৩ বছর বয়সের মধ্যে মাসিক শুরু হয়। প্রত্যেক মাসে হয় বলে একে মাসিক বা পিরিয়ড বলে। আবার অনেকে বলে ঋতুস্রাব বা মিনস্ট্রুয়েশন।
- শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে মাসিক ৩ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। সাধারণত প্রতি ২৮ দিন পর পর একবার মাসিক হয়। মাসিক শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকে পরবর্তী মাসিকের আগের দিন পর্যন্ত সময়কে মাসিক চক্র বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষে এই চক্র কাল ২৮ দিনের চেয়ে কম বা বেশী সময়ের হতে পারে। ব্যক্তিভেদে নিঃসৃত রক্তের পরিমানেও তারতম্য হতে পারে।
- মাসিক মানে শরীর খারাপ বা কোন অসুখ নয়। এ সময় সব রকম খাবার খাওয়া যায়।
- মাসিক হলে কেউ অশুচি হয়ে যায় না। এ সময় সব কাজ করা ও সর্বত্র যাওয়া যায়।

৫.৪ স্যানিটারি উপকরণ ব্যবহার,রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে কেবল মাসিককালীন ব্যবস্থাপনাকেই বোঝায় না। বরং এর সাথে সম্পর্কিত সামাজিক রীতিনীতি,বিশ্বাস ও বিধিনিষেধকেও বোঝায়। মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিচের বিষয়গুলোতে যত্নবান হওয়া জরুরি-

- সঠিক স্যানিটারি উপকরণ বাছাই, যেটি আরামদায়ক, বেশী শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ও রক্ত লিক হওয়ার আশঙ্কামুক্ত;
- কাপড় ব্যবহার করলে অবশ্যই প্রতিবার তা ভালোভাবে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধোয়া ও রোদে শুকানো;
- স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করলে ব্যবহারের পর ভালভাবে কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা;
- ন্যাপকিন বা কাপড় বদলানোর পর অবশ্যই সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুয়ে নেওয়া;
- রক্ত লিক হয়ে কাপড়ে দাগ লাগার আশঙ্কামুক্ত থাকতে ভালোভাবে ফিটিং হয় এমন স্যানিটারি উপকরণ ব্যবহার করা;
- প্রতি ৪-৬ ঘন্টা পর পর প্যাড বদলানো। তবে প্রথম দুদিন রক্তপ্রবাহের পরিমান বেশী থাকলে আরো ঘন ঘন বদলানো লাগতে পারে;
- পরিধানের কাপড় পরিষ্কার রাখা এবং সম্ভব হলে পরিচ্ছন্নতার কাজে গরম পানি ব্যবহার করা;
- পরবর্তী মাসিকে ব্যবহার করতে হলে কাপড় শুষ্ক স্থানে রাখতে হবে। স্যাঁতস্যাতে জায়গায় রাখা কাপড় ব্যবহারে চুলকানি সহ নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫.৫ মাসিকের সময় পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা

- মাসিকের দিনগুলোতে নিয়মিত গোসল করতে হবে।
- যোনীপথ ও এর চারপাশ পরিষ্কার পানি ব্যবহার করে নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে।
- মাসিকের কাপড় বা প্যাড ভিজে গেলে প্রতি চার-ছয় ঘন্টা পর পর বদলাতে হবে যাতে করে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ না হয়।
- কখনই ভেজা বা অপরিষ্কার কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করা যাবে না।
- ব্যবহার করা কাপড় বা প্যাড বদলানোর পর হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।
- পর্যাপ্ত বাতাস ও রোদ আসে এমন জায়গায় মাসিকের কাপড় শুকাতে হবে,স্যাঁতস্যেতে জায়গায় কাপড় শুকাতে দেয়া যাবে না।
- কাপড় রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার ও শুকনো স্থানে রাখলে পরবর্তী মাসিকের সময় তা ব্যবহার করা যায়।
- ব্যবহৃত প্যাড কাগজে ভালভাবে মুড়িয়ে আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলতে হবে, টয়লেটের মধ্যে কোনভাবেই প্যাড ফেলা যাবেনা, এতে সুয়ারেজ লাইন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- কাপড় শুকানোর পর পরিষ্কার কোন প্যাকেটে ভরে পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে;
- মাসিকের সময় বেশী দুর্বলতা কিংবা অন্য কোন সমস্যা হলে মা,বোন কিংবা পরিবারের অন্য কোন বিশ্বস্ত প্রিয়জন,বন্ধু বা শিক্ষকের সহায়তা নিতে হবে;
- একই মাসে মাসিকের পর পুনরায় রক্তপাত হলে কিংবা রক্তপাত সাত দিনের বেশী থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৫.৬ মাসিকের সময় খাদ্য খাবার

মাসিকের সময় সব খাবার খাওয়া যায়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও সমান পুষ্টির দরকার হয়। বয়ঃসন্ধিকালে দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধির জন্য সকলেরই সমান পুষ্টির প্রয়োজন। বিশেষ করে মাসিকের সময় মেয়েদের শরীরে যে ঘাটতি সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য বেশী করে পুষ্টিকর খাবার এবং আয়রন ও ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খেতে হয়।

- কচুশাক, লাউশাক, পাটশাক, লালশাক, কলা, গুড়, ডিম, কলিজা, শুটকি মাছ ইত্যাদি খাবারে প্রচুর পরিমানে আয়রন থাকে;
- গুড়, ডিম, দুধ, দই, ছোট মাছ, মাংস ইত্যাদি খাবারে প্রচুর পরিমানে ক্যালসিয়াম থাকে।

আমাদের সমাজে একটা ধারনা আছে যে মাসিকের সময় দুধ, ডিম, মাছ অথবা অন্য কোন পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত নয়।অথচ মাসিকের সময় মেয়েদের শরীরে যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তা পূরণের জন্য আমাদের বরং বেশী করে শাঁকসবজি ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত।

৫.৭ মাসিক স্বাস্থ্য ব্যস্থাপনার অপর্যাপ্ততা এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি

মাসিক সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা এবং চর্চা ছাড়াও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় অপর্যাপ্ততার কারণে এ সময় কিশোরী মেয়েরা অনেক সমস্যা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখোমুখি হয়ে থাকে। অপর্যাপ্ত এবং অপরিচ্ছন্ন টয়লেট ব্যবস্থা নানা রকম সংক্রমনের কারণ হতে পারে। যৌনবাহিত সংক্রমণসহ দেহের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য সংক্রমণের ঝুঁকি ঋতুকালে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী। কারণ রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে পথ তৈরী হয় তা জরায়ুর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশের জন্য অতি অনুকূল। তাই মাসিক সংক্রান্ত অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনা এই সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়।

অস্বাস্থ্যকর আচরণ

কিছু কিছু অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস সংক্রমণের ঝুঁকি আরো বাড়ায়। অপরিষ্কার ন্যাকড়া বা কাপড় ব্যবহার,বিশেষ করে সেটা যদি যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়,তাহলে অবাঞ্চিত ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়,যা থেকে সংক্রমণ হতে পারে।কেউ কাপড়ের টুকরা বা তুলা যৌনাঙ্গে প্রবেশ করায়। একই প্যাড বার বার ব্যবহার সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। আবার ব্যবহৃত কাপড় বা স্যানিটারি প্যাডটি সময় মত পরিবর্তন না করলেও নানা রকম রোগ সংক্রমণ হতে পারে। যৌনাঙ্গের ভেতরে জোর করে পানি প্রবেশ করালে যৌনাঙ্গে ছত্রাকের যে স্বাভাবিক ভারসাম্য থাকে, তা নষ্ট হয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। পেছন থেকে (পায়ু পথ থেকে যৌনাঙ্গের দিকে) সামনের দিকে ঘষলে বা পরিষ্কার করলে পায়ু পথের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া যৌনাঙ্গে ইনফেকশন বা সংক্রমণ ঘটাতে পারে। যৌন মিলনের সময় পায়ু পথে অবস্থিত Escherichia coli পায়ু পথ থেকে বেরিয়ে এসে মূত্রনালী বা যৌনাঙ্গে স্থানান্তরিত হতে পারে;যেমন-এইচআইভি বা হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস। সুরক্ষা না নিয়ে মাসিককালীন যৌনমিলন এই ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। সর্বোচ্চ পরিমান এইচআইভি বা হেপাটাইটিস-বি থাকে রক্তে এবং অল্প পরিমান দেখা যায় শরীরের অন্যান্য নিঃসরণে, যেমন-বীর্য বা নারীর যৌনাঙ্গ নিঃসৃত তরলে।

এখানে মাসিককালীন কিছু অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনার ফলাফল দেখানো হলো-

অপরিচ্ছন্ন উপকরণের ব্যবহার (কাপড়,স্যানিটারি ন্যাপকিন)।	যোনিপথে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ ও নানা রকম সংক্রমণ।
কাপড়/স্যানিটারি ন্যাপকিন খুব কম বদলানো। অথ্যাৎ ৪-৬ ঘন্টা পর পর প্যাড বা কাপড় পরিবর্তন না করা।	ভেজা প্যাড বা কাপড় ব্যবহার করলে ত্বকে জালা পোড়া হতে পারে।এছাড়াও এতে চুলকানি হয়ে থাকে। অতিরিক্ত চুলকানির ফলে সংক্রমণ থেকে ঘা হয়ে যেতে পারে।
রক্ত প্রবাহ কম থাকা কালে উচ্চ শোষণক্ষমতা সম্পন্ন উপকরণ (কাপড় বা প্যাড) ব্যবহার।	এ ধরনের উপকরণে ক্ষতিকারক টক্সিন বা বিষ তৈরী হয়,যা যে কোন জীব দেহের জন্য ক্ষতিকারক।
স্যানিটারী উপকরণ হিসেবে অনিরাপদ কাপড়,টিস্যু পেপার বা প্যাড ব্যবহার করা, বিশেষ করে অন্যের ব্যবহৃত অপরিচ্ছন্ন কাপড় ব্যবহার করা।	অন্যের দেহের রোগজীবাণু প্রবেশের আশঙ্কা থাকে।
ব্যবহৃত স্যানিটারি প্যাড বা কাপড় অনিরাপদ উপায়ে অপসারণ করা।	পরিবেশ দূষিত হয় ও জীবানু আক্রমণের ঝুঁকি তৈরী হয়।
মাসিকের কাপড়/ন্যাপকিন বদলানোর পর ভালোভাবে হাত না ধোয়া।	হাত থেকে দেহে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে।

৫.৮ মাসিক নিয়ে ভুল ধারণা ও কুসংস্কার

মাসিক নিয়ে ভুল ধারণার শেষ নেই। সঠিক তথ্যের অভাবে মনে আতংক কাজ করে আবার স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিচর্যা করতে পারে না। মাসিক সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা এবং এর বিপরীতে সঠিক ধারণার কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

ভুল ধারণা	সঠিক ধারণা
মাসিক লজ্জার বিষয়	মাসিক কোন লজ্জার বিষয় নয়। মাসিক সব মেয়েদেরই হয়। এটি একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া
মাসিকের রক্ত দূষিত হয়	মাসিকের রক্ত কোনো প্রকার দূষিত রক্ত নয়। হরমোনের প্রভাবে প্রতি মাসে জরায়ুতে এই রক্ত তৈরী হয় এবং স্বাভাবিক নিয়মে বের হয়ে যায়।
মাসিকের সময় মাছ ও টক খাওয়া যাবে না	এ সময় মেয়েদের শরীর থেকে প্রচুর রক্ত বের হয়ে যায়। তাই বেশী খাবার খেতে হয়। শরীরের ক্ষয় পূরণ হয় এমন খাবার যেমনঃ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, শাকসবজি, ফলমুল ইত্যাদি বেশী করে খেতে হবে।
মাসিকের সময় সব ধরণের কাজ করা যায় না	মাসিক চলাকালে শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী সব কাজ করা যাবে, যেমনঃ অফিস আদালত, কলকারখানায় কাজ করা, স্কুলে যাওয়া, খেলাধুলা করা, বেড়ানো ইত্যাদি। তবে পাশাপাশি বিশ্রাম নিতে হবে।

৫.৯ জটিলতা নিরসনে চিকিৎসকের পরামর্শ

মাসিকের সময় নিম্নোক্ত কোন জটিলতা দেখা দিলে দেরী না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ঃ

- অতিরিক্ত রক্তস্রাব হলে
- সাত দিনের বেশী রক্তস্রাব চললে
- মাসে একবারের বেশী রক্তস্রাব হলে
- কালো জমাট রক্ত পড়লে
- তলপেটে ও কোমরে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভূত হলে
- জ্বালা যন্ত্রনা হলে
- গাঁয়ে জ্বর থাকলে।

বিলম্বিত মাসিক

ঋতুস্রাবের উপযোগী বয়সেও ঋতুস্রাব না হওয়া হলো বিলম্বিত মাসিক । এর লক্ষণগুলো হলো স্তনের বিকাশ শুরু হবার তিন বছরের মধ্যেও মাসিক শুরু না হওয়া, ১৫/১৬ বছর বয়সেও মাসিক না হওয়া এবং স্তনের বিকাশ ও অন্যান্য শারীরিক পরিবর্তন না হওয়া ; যোনির অস্বাভাবিকতা ; থুতনি, মুখমন্ডল, ঠোঁটের উপরের অংশ, বুক ও স্তনের বোটার চারপাশ ও তলপেটে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চুল গজানো ইত্যাদি। এরকম লক্ষণ দেখা দিলে কখনো কখনো চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে।

মাসিক না হওয়া কখন স্বাভাবিক ?

- গর্ভবতী অবস্থায়
- ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়ালে
- খুব কম খেলে
- মেনোপজ হলে

যদি কোন অসুস্থতাজনিত কারণে মাসিক বন্ধ থাকে তাহলে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। সেরকম মনে হলে বা প্রজনন অঙ্গে কোনো অসুস্থতা অনুভব করলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। মাসিক-সংক্রান্ত কোন সমস্যা গোপন না করে তা অভিভাবক বা বিশ্বস্ত কারো সাথে আলোচনা করা ভালো, কারণ এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা না করলে সমস্যা শুধু বাড়তেই থাকে।

অনিয়মিত মাসিক

সাধারণত আগের মাসিকের তারিখ থেকে ২১ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে পরের মাসিক শুরু হওয়ার কথা। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায়ও কখনো কখনো দুই একদিন আগে-পরে হতে পারে। কিন্তু তা যদি আগের মাসিকের তারিখ থেকে ২১ দিনের আগে অথবা ৩৫ দিনের পরে হয়, তবে তাকে অনিয়মিত মাসিক বলা হয়। মাসিকের শুরুতে বা শেষ পর্যায়ে এসে এ রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া,প্রতিমাসে দুই বা তিন বার ঋতুস্রাব হওয়া,শুরু হওয়া এক বা দুইদিন পর শেষ হয়ে কিছু দিন পর আবার ঋতুস্রাব শুরু হওয়া এবং এক নাগাড়ে অনেকদিন ধরে স্রাব হতে থাকাও অনিয়মিত মাসিকের লক্ষণ।

মাসিক অনিয়মিত হওয়ার কারণ

- অতিরিক্ত মানসিক চাপ;
- অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ বা দেহে পুষ্টির ঘাটতি;
- মাসিক শুরু হওয়ার প্রথম দুই বছর;
- প্রচুর ব্যায়াম;
- কোন বিশেষ ওষুধ গ্রহণ;
- মেনোপজ হওয়ার কাছাকাছি সময়।

মনে রাখতে হবে যে

- মাসিক শুরু হওয়া গড় বয়স ৯ থেকে ১৫ বছর হলেও আমাদের দেশে অনেক মেয়েরই সাথারণত ১২ বছর বয়সে হয় ।কারো আবার ৯ বছরেই আরম্ভ হয়ে যায়,আবার কারো বা এটা ১৮ বছরেও শুরু হতে পারে। এটি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।
- একই ভাবে, কারো মেনোপজ ৪০ বছর বয়সে আরম্ভ হতে পারে, কারো-বা এটা হতে পারে ৫৫ বছর বয়সে।
- মাসিক চলার স্বাভাবিক সময়সীমা ৩ দিন থেকে ৭ দিন ধরা হলেও কারো বা ১০ দিন পর্যন্ত চলতে পারে।
- মাসিক চক্রের সাধারণ সময়সীমা ২৮ দিন। কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে এটি ২৪ দিনও হতে পারে। আবার কারো-বা হতে পারে ৪৫ দিন পর্যন্ত।
- প্রথমবার মাসিক শুরু হবার পর দুই বছর বা তার কিছু বেশী সময় মাসিক অনিয়মিত হতে পারে। এর কারণ হলো তাদের প্রজনন অঙ্গের গঠন তখনো পরিপূর্ণ হয়নি। এ সময়ের পরে স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের মাসিক নিয়মিত হয়ে ওঠে। কাজেই অল্প বয়সী মেয়েদের, যাদের প্রথম মাসিক হয়েছে তাদের মাসিক অনিয়মিত থাকলে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। বরং মানসিকভাবে দুশ্চিন্তামুক্ত থেকে পরিমিত বিশ্রাম গ্রহণ ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।
- মেয়েরা তাদের মাসিক চক্র নিয়মিত হচ্ছে কিনা তা বোঝার জন্য ফোনে বা দেয়ালের ক্যালেন্ডারে দাগ কেটে রাখতে পারে।

ঋতুস্রাব সংক্রান্ত অন্য অস্বাভাবিকতাগুলো হলো অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বা মেনোরেজিয়া, তলপেটে ব্যথা বা ডিজমেনোরিয়া, সাদা স্রাব বা লিউকোরিয়া ইত্যাদি। এসব অসুবিধা নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই এ ধরনের অসুবিধা হয়, আবার তা কাটিয়েও ওঠা যায়। এই সমস্যাগুলোকে ধীরস্থির ভাবে মোকাবেলা করতে হবে।

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বা মেনোরেজিয়া

ঋতুস্রাবের সময় প্রচুর রক্তপাত ও পেটে ব্যথা হওয়াকে মেনোরেজিয়া বলে। ঋতুস্রাবের প্রথম দিনগুলোতে প্রতি ঘন্টায় কাপড় বদলানোর প্রয়োজন হলে, ঋতুস্রাব ৭ দিনের চেয়েও বেশী সময় স্থায়ী হলে,মাসিকের রক্তের সাথে রক্তের বড় বড় চাকা গেলে, অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটতে থাকলে, ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ এবং শ্বাসকষ্ট অনুভূত হলে বুঝতে হবে যে মেনোরেজিয়া হয়েছে।এ রকম লক্ষণ দেখা গেলে দেরী না করে চিকিৎসকের মরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসক এজন্য পরীক্ষা করিয়ে ওষুধ সেবন সহ অন্যান্য পরামর্শ দিতে পারে।

তলপেটে ব্যথা বা ডিজমেনোরিয়া

ঋতুস্রাবের সময় তলপেটে ব্যথা হওয়াকে ডিজমেনোরিয়া বলে। তলপেটে হালকা ব্যথা, ধড়ফড়ানি এবং মাংসপেশিতে যন্ত্রনা, পিঠের নিচের দিকে এবং উরুতে ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া, পাতলা পায়খানা, শরীরে ঘাম হওয়া ও মাথা ঝিমঝিম করা হলো ডিজমেনোরিয়ার লক্ষণ। ছোট বেলায় অনেক মেয়ের মাসিকের সময় ব্যথা হয়, অনেক সময় বয়স বাড়ার সাথে সাথে এইসমস্যা কমেও যায় এবং সন্তান জন্মদানের পর ব্যথার সমস্যাও থাকেনা। আবার কারো কারো পরিণত বয়সেও থেকে যায়। অনেক মেয়ের ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং ঋতুস্রাব চলাকালেও ব্যথা হয়। কখনো কখনো এই ব্যথা জরায়ুর টিউমারের কারণে হতে পারে। তবে অন্য কারণেও হয়। সঠিক কারণ জানার জন্য আমাদের উচিত এ লক্ষণগুলো দেখাগেলে টিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

সাদাস্রাব বা লিউকোরিয়া

সাদাস্রাব হচ্ছে মেয়েদের যোনীপথে হওয়া একটি স্বাভাবিক স্রাব।ঋতুস্রাবের আগে-পরে বা গর্ভাবস্থায় এমনিতেই সাদাস্রাব হতে পারে।কাজেই সাদা বা হালকা হলুদ রঙের এই স্রাব একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে স্রাব যখন অতি মাত্রায় হয়,তখন তা আর স্বাভাবিক থাকেনা। যখন স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী পরিমাণ সাদাস্রাব নির্গত হয় তখন তাকে লিউকোরিয়া বলে।

অতিরিক্ত স্রাব নিঃসৃত হলে,যোনীপথে চুলকানি হলে, ভীষণ দুর্গন্ধ এবং সঙ্গে রক্ত কিংবা পুঁজের মতো স্রাব নির্গত হলে,তলপেটে ব্যথা ও জ্বর থাকলে বুঝতে হবে কোন সংক্রমণ বা ইনফেকশনের কারণে এটা হচ্ছে। এরকম ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

মাসিক নিয়ে কথা বলুন আজই, এখনই
(It's Time For Action)

স্কুল ভিত্তিক মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

সততা ষ্টোর থেকে বিনিময় মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনব।

স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের পর নির্দিষ্ট ঢাকনাযুক্ত বিনে ফেলব।

ব্যবহৃত ন্যাপকিন পুড়িয়ে ফেলব

BANGLADESH WASH ALLIANCE Supported by Duch WASH Alliance

Simavi

Uttaran

৬. সরকারি পদক্ষেপ

যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থল তৈরিতে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রসহ সকল সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির শিকার নারী ও শিশুদের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে যৌন হয়রানিমূলক সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধে মাহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা চেয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক জনস্বার্থে একটি মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ২৬ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে একটি নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করেন। **মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত - এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রনয়ণ না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ এবং পালন করা হবে।**

এই নীতিমালার ৩ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগদাতাগণকে যে সকল কর্তব্য পালন করতে হবে তা হলো ঃ

- যৌন হয়রানিমূলক সকল প্রকার ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ প্রয়োজনে তার প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করার জন্য যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

নীতিমালার ৪ ধারার যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

৪ (১) যৌন হয়রানি বলতে বুঝায় -

ক. অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমনঃ শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরণের প্রচেষ্টা;

খ. প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;

গ. যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;

ঘ. যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;

ঙ. পর্ণোগ্রাফী দেখানো;

চ. যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গী;

ছ. অশালীন ভঙ্গী, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলক্ষে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা;

জ. চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা;

ঝ. ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা;

ঞ. যৌন হয়রানির কারণে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া;

ট. প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;

ঠ. ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনে চেষ্টা করা

ক-ঠ ধারায় উল্লেখিত আচরণসমূহ নারীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং অপমানজনক। কোন নারী যদি এ ধরণের আচরণের শিকার হন এবং যদি তিনি মনে করেন যে, এই বিষয়ে প্রতিবাদ করলে তার কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাক্ষেত্রে বা যেখানে তিনি আছেন সেখানকার পরিবেশ তার উন্নয়নের জন্য বাধা বা প্রতিকূল হতে পারে তাহলে উক্ত আচরণসমুহ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে।

৪ (২) **সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ** বলতে বুঝায় যে কোন সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষ প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ, যিনি প্রতিষ্ঠানের অন্যায় আচরণ দমনে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বলবৎ করার ক্ষেত্রে ক্ষমতা রাখেন।

৪ (৩) শৃঙ্খলাবিধি বলতে বুঝায় সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন বা অধ্যাদেশ বা অধ্যাদেশের আওতাভুক্ত সকল বিধি যা সরকারী বেসরকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রণয়ণ করা হয়েছে।

ধারা ৫ ঃ সচেতনতা এবং জনমত সৃষ্টি

ক. সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার বৈষম্য যৌন হয়রানি এবং নির্যাতন দমন এবং নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে নিয়োগদাতা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেনতামূলক প্রকাশনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন। এ বিষয়ে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণির কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীগণকে এবং সকল কর্মক্ষেত্রে মাসিক এবং ষান্মাসিক ওরিয়েন্টেশন ব্যবস্থা রাখতে হবে।

খ. প্রতিষ্ঠানসমুহে প্রয়োজনীয় কাউন্সিলিং ব্যবস্থা থাকতে হবে;

গ. সংবিধানে উল্লেখিত অনুচ্ছেদ এবং সংবিধিবদ্ধ আইনে নারী শিক্ষার্থী এবং কর্মে নিয়োজিত নারীগণের যে অধিকারের বিষয়ে উলেখ করা আছে তা সহজভাষায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যক্তিগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের নিয়োগকর্তাগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ এবং কার্যকরী মতবিনিময় করবেন।

ঙ. সংবিধানে বর্ণিত জেন্ডার সমতা এবং যৌন অপরাধসমুহ সম্পর্কিত দিক নির্দেশনাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে হবে।

চ. সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত নিশ্চয়তাসমুহ প্রচার করতে হবে।

ধারা ৬ ঃ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

সকল নিয়োগকর্তা এবং কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যৌন হয়রানী প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ দাযিত্ব পালনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য পদক্ষেপ ছাড়াও তারা নিম্লোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ক. এ নির্দেশনায় উল্লেখিত ৪ ধারা অনুযায়ী যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে তা কার্যকরভাবে প্রচার ও প্রকাশ করা।

খ. যৌন হয়রানি সংক্রান্ত যে সকল আইন রয়েছে এবং আইনে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের জন্য যে সকল শাস্তির উল্লেখ রয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

গ. কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিবেশ নারীর প্রতি যেন বৈরী না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মজীবী নারী ও নারী শিক্ষার্থীগণের মাঝে এ বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে তুলতে হবে যে, তারা তাদেও পুরুষ সহকর্মী ও সহপাঠিদের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে না।

ধারা ৭ ঃ শৃঙ্খলাবিধি কার্যক্রম

এ নির্দেশায় উল্লেখিত ৪ ধারা অনুযায়ী যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে যথাযথ শৃঙ্খলাবিধি প্রণয়ন এবং কার্যকর করতে হবে।

ধারা ৮ ঃ অভিযোগ

যে সকল আচরণ এই গাইড লাইনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অশোভন আচরণসমূহ সম্পর্কে যদি অপরাধের শিকার নারী অভিযোগ করতে চায় তা গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তা প্রতিকারের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এজন্য নিম্লোক্ত বিষয়গুলি অর্ন্তভুক্ত করতে হবে ঃ

ক) অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখতে হবে

খ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

গ. অপরাধের শিকার নিজে অথবা বন্ধ বা চিঠি বা আইনজীবীর মাধ্যমে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

ঘ. অভিযোকারী ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে অভিযোগ কমিটির নারী সদস্যের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে

ঙ. অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করার জন্য ধারা ৯ অনুসরণ করতে হবে যা নিম্নরূপঃ

ধারা ৯ ঃ অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি

ক) অভিযোগ গ্রহণের জন্য, তদন্ত পরিচালনার জন্য এবং সুপারিশ করার জন্য সরকারি বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগ গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন করবে।

খ) কমপক্ষে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে যার বেশিরভাগ সদস্য হবেন নারী। সম্ভব হলে কমিটির প্রদান হবেন নারী।

গ) কমিটির দুইজন সদস্য সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে, যে প্রতিষ্ঠান জেন্ডার এবং যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করে।

ঘ) অভিযোগ কমিটি সরকারের কাছে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাৎসরিক অভিযোগ প্রতিবেদন পেশ করবে।

ধারা ১০ ঃ অভিযোগ কমিটির পরিচালনা প্রণালী

সাধারণভাবে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ পেশ করতে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য কমিটি যা করবে তা হল ঃ

ক) লঘু হয়রানির ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয়, অভিযোগ কমিটি সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়ে অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিবে এবং এ বিষয়ে সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন দাখিল করবে।

খ) অন্য সকল ক্ষেত্রে অভিযোগ কমিটির বিষয়টি তদন্ত করবে

গ) অভিযোগ কমিটি ডাকের মাধ্যমে রেজিস্ট্রিকৃত নোটিশ উভয় পক্ষকে এবং সাক্ষীদের প্রেরণ করা, শুনানী পরিচালনা, তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ এবং সকল সংশিশ্টষ্ট দলিল পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রাখবে।

এ ধরণের অভিযোগের ক্ষেত্রে মৌখিক প্রমাণ ছাড়াও পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। এ অভিযোগ কমিটির কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট অফিস সকল ধরণের সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে। অভিযোগ কমিটি অভিযোগকারীদের পরিচয় গোপন রাখবে। অভিযোগকারীর সাক্ষ্য গ্রহণের সময় এমন কোন প্রশ্ন করা যাবে না যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপমানজনক এবং হয়রানিমূলক হয়।

সাক্ষ্য গ্রহণের সময় যথাসম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। অভিযোগকারী যদি অভিযোগ তুলে নিতে চায় বা তদন্ত বন্ধের দাবি জানায় তাহলে এর কারণ তদন্ত করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।
অভিযোগ কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে। প্রয়োজনে এ সময়সীমা ৩০ কার্যদিবস থেকে ৬০ কার্যদিবস বাড়ানো যাবে। যদি এটা প্রমাণিত হয় যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা যাবে। অভিযোগ কমিটির বেশিরভাগ সদস্য যে রায় দিবে তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

ধারা ১১ ঃ শাস্তি

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (ছাত্র ব্যতিরেকে) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারেন এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রে, অভিযোগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তাদেরকে শ্রেণীকক্ষে আসা থেকে বিরত রাখতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে এবং সকল সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা বিধি অনুসারে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যদি উক্ত অভিযোগ দণ্ডবিধির যেকোন ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় তাহলে প্রয়োজনীয় ফৌজদারী আইনের আশ্রয় নিতে হবে যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচার হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০ (মাধ্যমিক-১)
www.moedu.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৫.০০১.০৪-৫২৯

তারিখ : ০৯ আষাঢ়, ১৪২২
২৩ জুন, ২০১৫

পরিপত্র

বিষয় : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের টয়লেট ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ।

পরিবারের বাইরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হলো মানুষের সদ্গুণাবলী বিকাশের আর্দশ প্রতিষ্ঠান । কিন্তু এখানে বহু শিক্ষার্থী একত্রে অবস্থানের কারণে সংক্রামক ব্যাধি দ্রুত ছড়াতে পারে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা প্রয়োজন। সেই বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেট গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল হাইজিন বেজলাইন সার্ভে অনুযায়ী প্রতি ১৮৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১টি টয়লেট আছে। কিন্তু এর ৪৫% নানা কারণে বন্ধ থাকে। দুই তৃতীয়াংশ টয়লেটের ভিতরে বা কাছাকাছি পানি ও সাবানের ব্যবস্থা থাকে না। এ ছাড়া টয়লেট সমূহের জানালা ছোট, আলো-বাতাসের অভাব, বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও বাল্ব থাকে না বা অকেজো; দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টয়লেটের অব্যবস্থাপনা মেয়েদের স্বাস্থ্য সমস্যা এবং উপস্থিতির উপর বেশি প্রভাব ফেলে। ঋতুকালীন (মাসিক) সময়ে. বেশির ভাগ মেয়েরা স্কুলে উপস্থিত হতে পারে না । শতকরা ৮০ভাগ উপস্থিতি না থাকায় উপ-বৃত্তি হতে বঞ্চিত হয়।

উপর্যুক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে এখন থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল:

১. টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির নজরদারিতে আনতে হবে। ম্যানেজিং কমিটি এ খাতে একটি পৃথক সংরক্ষিত তহবিলের ব্যবস্থা করবে। ম্যানেজিং কমিটি টয়লেটসমূহ নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করবে। সংরক্ষিত তহবিল হতে এ ব্যয় মিটানো যাবে।
২. টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শিক্ষকদের নেতৃত্ব দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্কাউট, গার্লস গাইড নিয়ে টয়লেট ও স্যানিটেশন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করে পালাক্রমে সারা বছরের জন্য টয়লেট পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব দিবেন।
৩. জেন্ডার বান্ধব স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। টয়লেটসমূহে আবশ্যিকভাবে ঢাকনাযুক্ত প্লাস্টিকের পাত্র রাখতে হবে।
৪. ভিন্নভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী টয়লেট নির্মাণ করতে হবে। শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।
৫. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ঋতুকালীন (মাসিক) বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য শিক্ষিকাকে নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব দিতে হবে।
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন (প্রয়োজনে অন-পেমেন্ট) রাখার ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটিকে উদ্যোগ নিতে হবে।
৭. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয় পরিদর্শক, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানীয় জল, টয়লেট ব্যবস্থা, মেয়েদের টয়লেট ব্যবস্থা, হাত ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৮. স্কুল স্যানিটেশনের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার জন্য স্থানীয় এনজিওসমূহকে জেলা প্রশাসন থেকে অনুরোধ জানাতে হবে। এনজিও, বেসরকারি সংস্থাসমূহ টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখা, পানীয় জল, হাত ধোয়ার বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাবে।

৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেটসমূহে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল এবং আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি মোশন সেপর, গ্রীন টেকনোলজি ব্যবহার করা যায়। টয়লেটে পর্যাপ্ত পানি এবং সাবানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে।

১১. স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (সরকারি-বেসরকারি) হতে অন্তত বছরে দুই বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার জন্য জেলা প্রশাসন উদ্বুদ্ধ করবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/২৩.০৬.২০১৫
(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা (তাঁকে এনজিওসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।)
৩. মহাপরিচালক , কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/বরিশাল/ যশোর/বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৭. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)।
৮. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৫.০০১.০৪-৫২৯

তারিখ ঃ ০৯ আষাঢ়, ১৪২২ / ২৩ জুন, ২০১৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/কারিগরি/মাদরাসা) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৬। যুগ্মসচিব(কলেজ/মাধ্যমিক-১/২/উন্নয়ন-১/২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিবের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (পরিপত্রের খসড়াটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

(মোঃ মুহিবুর রহমান)
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৬৭৮০

৭. সুপারিশ সমূহ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।দেশের অন্যান্য উপকূল অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রধর্মী। পানি সমস্যা এ এলাকার মূল সমস্যা। এলাকার আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করছে কার্যকরী ভাবে পানি সমস্যার সমাধানের উপর।বিশ্ব জলবায়ূ পরিবর্তনের দরুন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঘূর্ণিঝড় সৃষ্ট জলোচ্ছাসের তীব্রতা প্রভৃতি সমস্যা যুক্ত হয়ে এলাকাটি এখন অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এ এলাকার অনন্যধর্মী প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা না করে এবং খন্ডিত কোন উদ্যোগ গ্রহণে ফলপ্রসূ কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি। সমস্যা মোকাবেলায় তাই প্রয়োজন ভৌগলিক বিবেচনায় এলাকার পানি সমস্যার গুরুত্বটি অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণে করণীয় বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১. জাতীয় নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালায় দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার লবনাক্ততার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ভাবে অর্ন্তভূক্ত করা এবং সেই অনুযায়ী পর্যাপ্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা।

২. ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের ব্যাপক অনুসন্ধান, প্রচলিত বিভিন্ন প্রযুক্তির কার্যকরী ব্যবহার এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন বিষয়ে এলাকায় একটি হাইড্রোলজিক্যাল সার্ভে করা।

৩. এলাকার সমস্যা নিরসনে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৪. উজান তথা পদ্মা প্রবাহের সাথে এলাকার পুনঃসংযোগ করা যাতে মিষ্টি পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

৫. জলাবদ্ধতার কবল থেকে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা রক্ষার জন্য জোয়ারাধার (টিআরএম) ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করা।

৬. উপকূলীয় বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া, উপচানো এবং জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য উপকূলীয় বাঁধ উঁচু ও মজবুত করা।

৭. যেখানে গভীর নলকূপ আছে সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৮. খাস জলাশয়গুলো ইজারা প্রদান না করা, ভরাট হওয়া জলাশয়, পুকুর, দীঘি পুনঃখনন করা এবং নতুন নতুন দীঘি ও পুকুর খনন করা।

৯. লবনাক্ততার তীব্রতা হ্রাসের জন্য চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রন করা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পরিমাণহ্রাস করা।

১০. পিএসএফ, রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং এবং অন্যান্য বিকল্প ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ জোরদার ও টেকসই করা।

১১. ল্যাট্রিন স্থাপনে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২. মাসিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনার বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে লেখা

উপসংহার ঃ

স্বাস্থ্যব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা। এ জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা, উপকরণ ও অবকাঠামোর সুষ্ঠ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ। সরকারের উচিত নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সামগ্রী সহজলভ্য করা। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য সরকারী ব্যবস্থা যথেষ্ট অপ্রতুল।

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল অতি ঝুঁকিপূর্ণ একটা এলাকা। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় এ এলাকায় দারিদ্র্যের হারও বেশী। মাত্রাতিরিক্ত লবনাক্ততা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, জলোচ্ছ্বাস এবং জলাবদ্ধতা এসব সমস্যা মোকাবেলার কার্যকরী উদ্যোগ বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করছে সমস্যা সমাধানের বিষয়টি। সমস্যা সমাধানে দরিদ্র, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় এ এলাকার স্বতন্ত্রধর্মী অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করে সেই অনুযায়ী সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।